

গণতন্ত্র কিভাবে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে?

মূলঃ আবু ইয়ামান

অনুবাদঃ মাওলানা হামিদুর রহমান



গণতন্ত্র কিভাবে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে?

মূলঃ আবু ইয়ামান

অনুবাদঃ মাওলানা হামিদুর রহমান



উসামা প্রকাশনী



“ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা না চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বাধীন, ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের চাইতে ভালো মানুষ, ধর্মের সম্পর্ক শুধুমাত্র ইবাদতের সাথে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নয়, ইসলাম মহিলাদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখার কথা বলে না, ইসলামে স্বাধীনতা রয়েছে ...!”

জীবনে হয়তো আপনি এ কথাগুলো বা এ জাতীয় আরো বিভিন্ন কথা অনেকবারই পড়েছেন বা শুনেছেন। এই কথাগুলোর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, “ইসলাম আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে আমরা ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য নই।”

সুতরাং সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্বে আপনি দেখে থাকবেন যে, দ্বীন থেকে দূরে সরে থাকা মুসলমানগণ একদিকে তো মুখে কালিমা পড়ে, ইবাদতের পাবন্দী করে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের নাম নেয়। কিন্তু অপরদিকে সামাজিক জীবনে তারা সুযোগমতো গাইরুল্লাহর তৈরীকৃত আইনে বিচার-ফায়সালা করিয়ে নেয়, অর্থনৈতিক লেনদেনসমূহ সুদভিত্তিক নিয়মে পরিচালিত করে এবং সেই সুদী কামাই থেকে প্রাপ্ত অর্থ আবার দান-সাদাকাও করে। অমুসলিমদের বানানো পদ্ধতিতে রাজনীতি করে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহায়তা করে।

মুসলিম বিশ্বে এ শ্রেণীর মানুষ কম নয়; বরং তাদের সিংহভাগেরই আজ এই দশা।। যাদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উচ্চতর শিক্ষিত গুরুজন, বিত্তবান ও সাধারণ নাগরিক সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই সাহায্যে কেরাম ও তাবয়ীদের যুগে ইসলাম তার স্বমহিমায় যেভাবে ভাস্বর ছিল, বর্তমানে আপনার হয়ত কালেভদ্রেও কোথাও তার দেখা মिला দায় হয়ে দাঁড়াবে। এ এক বিশাল ট্রাজেডি ও এক বিরট ফেতনা। যা যুগ যুগ ধরে মানুষদের পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ এই

ফেতনা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল কিভাবে? এর নেপথ্যে কারণ কী রয়েছে? অথবা কী-ই বা তার ইতিহাস?

উম্মাহর চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে হাজারো ফেতনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যেগুলো একটা সময় পর্যন্ত জনমনে গোমরাহীর বীজ বপণ করে গিয়েছে, বহু লোক তার ফাঁদে পা দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ফেতনা তার আয়ুষ্কাল শেষ করে বিদায়ও নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ফেতনা কম-বেশি দুইশত বৎসর যাবত ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করছে। যা এ উম্মাহকে ঈমানী-আমলী, দ্বীনি-দুনিয়াবী সবদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে ধ্বংসের একেবারে অতল গভীরে নিষ্ক্ষেপ করেছে। সার্বিকভাবেই এ ফেতনা পূর্বের যে কোন ফেতনার চাইতে মারাত্মক। যার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে দেয়া হল:

১) পূর্বেকার ফেতনাগুলোর পরিধি থাকত সীমিত, নির্দিষ্ট গণ্ডির সীমিত কিছু মানুষ তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হত। ওলামায়ে কেরাম যখন সেই ফেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতেন, তখন নিমিষেই সেই ফেতনা অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিলে যেত। পক্ষান্তরে এ ফেতনার পরিধি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, দিনদিন যার প্রভাব কেবল বেড়েই চলেছে। আর তার দ্বারা শুধু মুসলমানগণই নয়; বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরাই প্রভাবান্বিত হচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে এ ফেতনার সর্বপ্রথম শিকার হয়েছে খৃষ্টজগত।

২) পূর্বেকার ফেতনাগুলোর উদ্ভব ঘটত মুসলমানদের মধ্য থেকে। পক্ষান্তরে এ ফেতনা বাহির (পশ্চিমা) থেকে এসে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। এর পিছনে একদিকে যেমন ইউরোপ আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক শক্তিও রয়েছে, অপরদিকে এর ভিতর রয়েছে মানুষের কু-প্রবৃত্তির খোরাকও। যা দেখার পর

মানুষদের বিবেক-বুদ্ধি বিকল হয়ে যায়। তারা তখন তাদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আর উপকৃত হতে পারে না। কেননা সাধারণ মানুষরা চর্মচক্ষুর স্থূলদর্শনকেই বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ মনে করে থাকে। এ কারণে এক্ষেত্রে এসে ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক তাদেরকে খণ্ডন করে যাওয়াও আশানুরূপ ফল বয়ে আনতে পারে না।

৩) ইউরোপ ছয়শো বৎসর যাবত আধুনিকতার এমনভাবে শিকার হয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. এর রেখে যাওয়া সঠিক আদর্শও আজ তাদের কাছে অচেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে তারা আজ জানোয়ারে পরিণত হয়েছে এবং সেই এক আধুনিকতার ফেতনার অন্তরালে তাদের মাঝে আজ জন্ম নিয়েছে হাজারো ফেতনার বীজ।

৪) উপনিবেশবাদে সফলতা লাভ করার পর তারা মুসলিম বিশ্বের উপর সকলে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই একজন সাধারণ মুসলমান এই ক্রমাগত ফেতনার সাথে পেরে উঠতে পারে না। এক গোমরাহী থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই অপর গোমরাহী এসে তাকে পেয়ে বসে।

৫) পূর্বেকার ফেতনাগুলো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণত ইসলামি পরিভাষাসমূহকে ব্যবহার করত, যা রোধ করা ছিল তুলনামূলক সহজ। কিন্তু এই নব্য ফেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে নিজস্ব ভাষা ও নতুন পরিভাষা নিয়ে। এ কারণে এ ফেতনার একেবারে অকেজো অকেজো থিওরিগুলোও তুলনামূলক গুরুগম্ভীর পরিভাষাসমূহের মাঝে সহজেই আত্মগোপন করার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে মানুষ অযথাই সেগুলোর দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়।

আধুনিকতার এ ফেতনায় একজন মুসলমানের কাছে ইসলাম কেবল একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের মান রাখে। যেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীন। মন চাইলে আমল করবে,

না চাইলে করবে না। কেউ আমল করা পরিহার করলে অন্য কেউ তাকে নিষেধ করতে পারবে না; বরঞ্চ তাকে খারাপও বলতে পারবে না, এমনকি খারাপ মনেও পর্যন্ত করতে পারবে না। কেননা আধুনিকতার ফেতনা প্রত্যেককে তার মনমতো করে চলার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে।

এ আধুনিকতার ফেতনা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে কয়েকটি উপায়ে-

- ✚ উপনিবেশবাদের মাধ্যমে
- ✚ গণতন্ত্রের মাধ্যমে
- ✚ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে
- ✚ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে

উপনিবেশবাদ

পনেরশো খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যখন শিল্প বিপ্লব ঘটে, ইউরোপের যখন নতুন করে পাখা গজাতে শুরু করে, তখন মুসলিম বিশ্বই ছিল তাদের চোখে প্রথম টার্গেট। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটা, আমেরিকা আবিষ্কার হওয়া, ইউরোপ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে নতুন নৌপথের আবিষ্কার হওয়া ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রকে বাধ্য করে তাদের নিজস্ব গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ জবরদখল করতে। যার সূচনা করেছিল স্পেন ও পর্তুগাল। অতঃপর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৃটেন ও ফ্রান্সও বাঁপিয়ে পড়ে এই ময়দানে। ফ্রান্স আফ্রিকার কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং বৃটেন আরব ও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ দখলে নিয়ে নেয়। তারা সেসব রাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ হাতিয়ে নেয়, স্বর্ণ-রৌপ্যের খায়ানা করায়ত্ত করে, খুনাখুনি-রাহাজানি করে সেগুলোতে চষে বেড়ায়

এবং বিনা অতিরঞ্জে সেখানকার কোটি কোটি মুসলমানদেরকে গণহত্যা করে। সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা (গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করে। নিজেদের আইন-কানুন প্রয়োগ করে। তাদের উপর নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় এবং লোকদেরকে সে জীবনধারা অনুযায়ী চলার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতকে শক্তিশালী করে। পরিশেষে তাদের রক্ত শোষণ করার পর নিজেদের মানসিক ক্রীতদাসদেরকে সে সকল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসক বানিয়ে দিয়ে তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। আর সে রাষ্ট্রগুলো সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার (গণতন্ত্রের) খুঁটির চারপাশে ঘানির বলদের মত অদ্যাবধি ঘুরপাক খাচ্ছে।

উপনিবেশবাদের এ সাফল্যই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার মূল ইন্ধন। এর নিমিত্তেই আজ এত অনিষ্টতা জন্ম নিয়েছে। যার সংস্কারসাধনের জন্য অসংখ্য অগণিত সংগঠন, কার্যালয় ও দল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; কিন্তু আর্থাগারের বুক চিরে আজও সেই কাঙ্ক্ষিত সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটছে না, যার জন্য তারা সকলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানব প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হল, মানুষ সর্বদা প্রতাপশালী শক্তির অধীনস্থ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। এ কারণে ভূপৃষ্ঠে যারা বিজয়ী থাকে, মানুষ অনায়াসেই সে পরাশক্তির জীবনপদ্ধতি বেছে নেয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন কুফরের কোমর ভেঙ্গে গিয়ে ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ পায় ও মানুষরা ইসলাম ছাড়া আর অন্য কিছুর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(الصَّف: ৭)

অর্থঃ “তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” (সূরা সাফ-৯)

গণতন্ত্র

সাদামাটা শব্দে বলতে গেলে গণতন্ত্র হচ্ছে সে ব্যবস্থার নাম, যে ব্যবস্থায় কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনা করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রণয়নের বুনিয়াদ হিসেবে বেছে নেয়া হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে। এক্ষেত্রে কেবল সে সকল লোকদের মতামতকেই গ্রহণ করা হয়, যাদেরকে জনগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করেছে। নিজেদের নির্বাচিত করা এ সকল লোকেরা সংসদে বসে রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করে। সে আইনের অধীনেই রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান, দল ও সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমনঃ বৃটিশ গণতন্ত্র, মার্কিনি গণতন্ত্র, ফরাসি গণতন্ত্র, ইত্যাদি। কিন্তু যে বিষয়টিতে এসে সব গণতন্ত্রই মিলে গেছে তা হল: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রার্থী কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা। গণতন্ত্রের এ কাজটিই হল সুস্পষ্ট কুফুরী।

এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে নির্দেশ দিয়েছেন- তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানমতেই নিজেদের পারস্পরিক বিষয়াবলীর মীমাংসা করে নিবে এবং নিজেদের বিষয়াবলী নিয়ে তোমরা ত্বাগুতের দারস্থ হবে না; বরং ত্বাগুতকে তোমরা অস্বীকার করবে। ত্বাগুত হচ্ছে প্রত্যেক সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব বা ব্যবস্থার নাম, যা লোকদেরকে তার নিজের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, যদিওবা তা আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে হোকনা কেন! পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ৬০) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (النساء: ৬১) فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (النساء: ৬২) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (النساء: ৬৩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ৬৪) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ৬৫)

অর্থঃ “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে যায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা‘আলা অবগত। অতএব আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন

কথা বলুন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোকেরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং হুঁচকিতে তা কবুল করে নেবে।” (সূরা নিসা: ৬০-৬৫)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য শুধুমাত্র কালিমার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং নিজেদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির মীমাংসাও আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহ মোতাবেক করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করায় না, আলোচ্য আয়াতে তাকে মুনাফিক, কাফির, ফাসিক ও যালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। কেননা, এর উপরই নির্ভর করবে যে, তার জীবন-পদ্ধতি ঐশী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হবে, নাকি পরিচালিত হবে মানুষের কামনা-বাসনা ও কু-প্রবৃত্তি দ্বারা?!

গণতন্ত্র আইন প্রণয়নের অধিকার বান্দাদের হাতে ন্যস্ত করে থাকে। আর এ আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়। আইন প্রণয়নের এ কাজটিকে জনগণের জন্য এক বিরাট সফলতা মনে করা হয় এবং একনায়কতন্ত্রের তুলনায় একে এক মহা সাফল্যমণ্ডিত শাসনব্যবস্থা মনে করা হয়। বরং বলা হয় যে, নিকৃষ্ট

থেকে নিকৃষ্টতম গণতন্ত্রও উন্নত একনায়কতন্ত্রের চাইতে ভালো। অথচ গণতন্ত্র কর্তৃক আইন প্রণয়নের অধিকার বান্দাদের হাতে অর্পণ করাটাই গণতন্ত্র কুফর হওয়ার প্রধান কারণ। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে যে সকল শরয়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সে বিধি-বিধান মোতাবেক ফয়সালা করাকে বান্দাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। বরঞ্চ ঈমানের জন্য এটাও আবশ্যকীয় যে, নিজেদের পারস্পরিক লেনদেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সালিশ মানবে এবং তাঁর কৃত মীমাংসার ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে কারো পক্ষ থেকে মঞ্জুরির জন্য উত্থাপিত যেকোন কানুনকে শাসকরা কানুন হিসেবে মঞ্জুর করবে কি না, এ ব্যাপারে তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ এক্ষেত্রে যদি সেই কানুনটি শরীয়াহ সমর্থিতও হয়, তবুও তাদের জন্য সে কানুন বানানো জায়েয হবে না। এর কারণ হচ্ছে: পার্লামেন্ট থেকে কোন আইন কেবল তখনই পাস হয়, যখন সাংসদদের জন্য তাতে সম্মতি জানানো বা তা প্রত্যাখ্যান করা উভয়টিরই স্বাধীনতা থাকে। আর এ বিষয়টিকেই আল্লাহ তা‘আলা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। অনন্তর আবার সেই কানুনটিকে বাস্তবায়ন করার সময় আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করে মানুষের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়ে এভাবে বলা হয় যে, তা পাকিস্তানী আইন, আফগানী আইন, (বাংলাদেশী আইন,) ইত্যাদি। গণতন্ত্রে কুরআনের আইন থাকলেও উদ্ধৃতি কুরআনের দেয়া হয় না। অথচ মুসলমানদের জন্য তো উদ্ধৃতিই আসল!!!

অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধানে এ কথা লেখা রয়েছে যে, রাষ্ট্রের কোন একটি আইনও কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে প্রণয়ন করা হবে না। তাই অনেক মুসলিমই

গণতন্ত্রকে ইসলামী মনে করে ভুল বুঝে থাকে। এর খণ্ডন বর্তমান যুগের একজন মহান ব্যক্তিত্বেরই যবান থেকে শুনুন।

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিয়াহুল্লাহ লিখেন:

“অতএব গণতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রধান রোকনটি হচ্ছে এই যে, গণতন্ত্রে জনগনকে সর্বোচ্চ বিধানদাতা মনে করা হয় এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটের উপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে অবশ্যপালনীয় ও অপ্রত্যাহারযোগ্য মনে করা হয় এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না।

তবে কোন দেশের সংবিধান যদি প্রার্থীদের এই আইন প্রণয়ন অধিকারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা বা হস্তক্ষেপ চালায়ও (যেমনঃ কোন কোন দেশের সংবিধানে লেখা থাকে যে, সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বা কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক আইনের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না) তথাপি এ বাধ্যবাধকতাটি এ জন্য অবশ্যপালনীয় হবে না যে, এ বাধ্যবাধকতা জনগনের উর্ধ্বতন কোন অথরিটি আরোপ করেছে বা এটি আল্লাহর নির্দেশ, যা সর্বাবস্থায় মেনে চলা আবশ্যিক। বরং তা অবশ্যপালনীয় মনে করা হবে কেবলমাত্র এই কারণে যে, এ বাধ্যবাধকতা স্বয়ং সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমেই এসেছে। অতএব সংখ্যাধিক্যের ভোট চাইলে কখনো তা বাতিলও করে দিতে পারে।

সারকথা এই যে, গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের ভোটকে (নাউয়ুবিল্লাহ) প্রভুত্বের স্থান দিয়ে রেখেছে। যার কোন সিদ্ধান্তকেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সুতরাং এই মূলনীতির উপরই পশ্চিমা বিশ্বে সংখ্যাধিক্যের ভোটের মাধ্যমে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম আইন-কানুন ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্যাভিচারের মত নিকৃষ্ট অপকর্ম থেকে শুরু করে সমকামিতার মত ঘৃণিত কাজকেও এই মূলনীতির ভিত্তিতে বৈধতার সনদ প্রদান

করা হচ্ছে। এই মতবাদ বিশ্বকে নৈতিক অবক্ষয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।” (সূত্র: হাকীমুল উম্মত রহ. এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা)

আইন প্রণয়নের অধিকার প্রদান করা ছাড়াও গণতন্ত্রে এমন আরো অনেক খারাবি রয়েছে, যা ইসলামের স্বভাব-চরিত্রের বিপরীত। যেমন: পদ ও দায়িত্বের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করা, দাবি জানানো, নিজের ও নিজের দলের প্রার্থীদের সত্য-মিথ্যা প্রশংসা করতে থাকা, বিরোধী দলের উপর সব ধরনের অবমাননাকর কথাবার্তা বলা, নির্বাচনে বিজয় লাভ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের অবৈধ গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা, অতঃপর নির্বাচনের পর বিজয়ী প্রার্থীরা দেশে যে পরিণাম বয়ে আনে, তাতে আমরা আমাদের দেশে বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি।

অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের উপর ইসলামের ল্যাভেল লাগিয়ে ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো এই আশায় মাঠে নামে যে, হয়ত এ পথেই সঠিক ইসলাম বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু আমাদের হয়ত পশ্চিমাদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই যে, তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।

১৯৯০ সালের ১২ই জুনে আলজেরিয়ায় পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট ৯৩ শতাংশ শহর-উপশহরের উপর নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের এ জনপ্রিয়তা দেশের সেনাবাহিনী ও বিত্তবান এলিট শ্রেণীর দু’চোখের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। এরপর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের প্রথম ধাপে ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট ৪৮ শতাংশ জনপ্রিয় ভোট লাভ করে। যদ্বরূপ তারা ২৩১ টি সীটের মধ্যে ১৮৮ টি সীট জিতে নিলে সেনাবাহিনী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে ও নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ বাতিল করে দেয়। তখন সামরিক

নেতৃত্বের এক সভায় জর্নৈক আলজেরিয়ান জেনারেল গোঁফে তা দিতে দিতে বলল: “তোমরা এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছ ঠিক; কিন্তু এত বড় এখনো হওনি”।

এরপর সেনাবাহিনী সে সময়কার প্রেসিডেন্ট ‘বিন জাদিদ’কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং ধর্মীয় চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে প্রায় অস্তিত্বহীন করে ফেলে। ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, রাজনৈতিক সংঘাত তৈরী হয় এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৯২ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একলক্ষ ষাট হাজারের অধিক মানুষ নিহত হয়। যাদের অধিকাংশই ছিল শহুরে মানুষ। সুবিবেচকদের বর্ণনা মতে সরকার নিজের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শহুরেদের হত্যা করে বিভিন্ন ইসলামি দলগুলোর উপর দায় চাপিয়ে দেয়।

৯০ এর দশক থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত আলজেরিয়ায় পাঁচজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এসেছে, বহু মন্ত্রী এসেছে ও গিয়েছে। কিন্তু একজন ব্যক্তিত্ব এমন রয়েছেন, যিনি অদ্যাবধি নিজের পদে সমাসীন রয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন সামরিক ইন্টেলিজেন্স আদালতের প্রধান! এর দ্বারাই অনুমান করুন যে, ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি মূলত: কার কাছে? তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিজয়ী সকল ইসলামি দলকেই দেশের প্রধানরা আকার-ইঙ্গিতে এ কথাই বুঝিয়ে আসছে যে, “তোমরা এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছ ঠিক; কিন্তু এত বড় এখনো হওনি”।

মিশরেও বিপ্লবের পর ২০১১ সালে যখন মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় এলো এবং মুহাম্মদ মুরসি ৫১ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল। তখন তারই নিয়োগ দেয়া আর্মি চীফ আব্দুল ফাত্তাহ সিসির হাতে সে পদচ্যুত হয়ে যায়। যে আব্দুল

ফাত্তাহ সিসি একদিনেই শতশত মুসলমানদের শহীদ করে দিয়েছে ও মুরসির (ইসলামি) শাসনব্যবস্থা বিলীন করে দিয়েছে।

পাকিস্তানে এম এম আই একটি প্রদেশে সংখ্যাধিক্যতা লাভ করে। তখন তাদের প্রতি সে সময়কার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের পক্ষ থেকে বাধা আসে এবং নিজেদের গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী সে তাদেরকে সেখানে কাজ করতে দেয়নি। বরং তাদের প্রতি অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছে যে, তারা নাকি “দুই শতাংশের ভোট পেয়েছে”।

এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে যদি কোথাও ইসলামি দলগুলোর কোন সফলতা আসেও, তথাপিও প্রত্যেক দেশেই সামরিক এলিটদের আকৃতিতে দুশমনদের সেই অস্ত্রধারীরা বিদ্যমান রয়েছে, যারা কোনভাবেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে দিবে না। যদিওবা তা দেশের অধিকাংশ জনগণের অভিলাষ হোক না কেন!

গণতন্ত্রে ইসলাম ও শরীয়তের এমন অবমাননা করা হয়, যা খেলাফতের জঘন্যতম অবস্থাতেও সম্ভবপর ছিল না। গণতন্ত্রে যে ব্যক্তিই নিজের ধন-দৌলত কিংবা পদমর্যাদার শক্তিবলে একবার সংসদে পৌঁছে যায়, সে শরীয়তের ব্যাপারে মুখ খোলাকে নিজের মৌলিক অধিকার বলে মনে করে। যেহেতু একটি শাসনব্যবস্থা অন্যদের থেকে ধার করেই আনা হয়েছে, তাই স্বভাবতই তা গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদেরই রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত করা হবে। যা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করে চলেছি যে, প্রতিটি বিষয়েই বৃটেন ও আমেরিকার গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়।

খেলাফত আমলেও মুসলমানদের চারিত্রিক অবস্থা আজকের চাইতে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু কোন একজনও ধর্মনিরপেক্ষবাদীর মুখে আপনি কখনো সেগুলোর কোন রেফারেন্স শুনতে পাবেন না। মানবতার সম্মান, নৈতিকতা ও স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রেই রেফারেন্স কেবল পশ্চিমাদেরই দেয়া হয়।

জাতীয়তাবাদ

খেলাফত ধ্বংসের পর সাইকস-পিকট চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। যেগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব গণ্ডি ও সীমানা থাকবে। জাতীয়তাবাদ বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আরো বেশী শক্তিশালী করে দিয়েছে। মুসলমানদের জন্য দেশ একটি ভ্রাতৃত্বের রূপ নিয়েছে। দেশই মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম ও স্বভাব-প্রকৃতিগত পরিচয়ের পরিবর্তে নতুন পরিচয় প্রদান করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি করে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা সহজেই একে অপরকে চিনতে পারে। জাতীয়তাবাদ মানুষদেরকে বিশেষকরে মুসলমানদেরকে তাদের স্বভাব-প্রকৃতিগত পরিচয় থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে নিজস্বতার পরিচয় প্রদান করেছে। সুতরাং আজ মুসলমানগণ পরস্পরে নিজেদের পরিচয় পাঠান, বালুচী, চিত্রলী, ইত্যাদি নামগুলো দ্বারা দেয় না। বরং তারা পরিচিতি লাভ করে পাকিস্তানি নামে। হেজাযী, মাক্কী, মাদানী ইত্যাদির পরিবর্তে নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করে সৌদী নামে। তাদেরকে আজ ইসলামের পরিবর্তে দেশকে ভালোবাসা ও দেশের প্রতি ইসলামের চাইতে বেশী আন্তরিক থাকার সবক দেয়া হয়।

প্রতিটি দেশের একটি জাতীয় ভাষা থাকে। যে ভাষার বন্ধনেই সে দেশের নাগরিকরা আবদ্ধ থাকে। সে ভাষাতেই তাদের শিক্ষা দান করা হয়। সে ভাষাতেই সরকারি যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করা হয়। সে ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষার প্রতি এ বিতৃষ্ণার দরুন অনেক মাতৃভাষা আজ প্রায় নিঃচিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

উম্মাহর মাঝে ফাটল তৈরীর পিছনে সবচাইতে বড় অবদান রেখেছে জাতীয়তাবাদ। বর্তমানে একজন মুসলমান নিজের দেশের অধিবাসীদের জন্য যে পরিমাণ চিন্তিত হয়, অন্য দেশের মুসলমানদের জন্য তার মাঝে সে পরিমাণ অনুভূতি জাগ্রত হয় না। কোন এক মুসলিম দেশে হামলা করা হলে তাতে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। বরং তাদের স্বার্থ থাকলে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সাথে নিজেও এসে মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হয়ে যায়। ইসলামে পারস্পরিক পরিচিতি হয়ে থাকে জাতি-উপজাতির ভিত্তিতে ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে থাকে তাকওয়ার ভিত্তিতে। আর জাতীয়তাবাদে পারস্পরিক পরিচিতি হয়ে থাকে দেশের ভিত্তিতে ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে থাকে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে। দেশের জন্যই তাদের জীবন-মরণ। দেশের খেদমত করাকে তারা তাদের সৌভাগ্যের সোপান মনে করে। দেশে সহাবস্থানকারী কাফেররাও আপন হয়ে যায়। অথচ অন্যান্য দেশের মুসলমানদেরকে পর মনে করা হয়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পাঠদান সরকারের জিম্মায় থাকে। যেখানে প্রাইমারি শিক্ষাকে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার মনে করা হয়। প্রাইমারি শিক্ষায়

সাধারণত: জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। যার মধ্যে জাতীয় ভাষা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা ও দেশজ গবেষণামূলক বিষয়গুলো—যেমন পাকিস্তানে ‘পাকিস্তান গবেষণা’ (বাংলাদেশে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’) ইত্যাদি বিষয়গুলো পাঠ্যসূচিতে থাকে। ইসলাম শিক্ষাকেও অন্যান্য বিষয়সমূহের মত একটি বিষয় মনে করা হয়। তাই ছাত্ররা পরীক্ষায় নকল করার সময় অন্যান্য বইগুলোর মত ইসলাম শিক্ষা বইয়ের পাতাও ছিড়ে নিজেদের পকেট ও মৌজায় ঢুকিয়ে নেয় ও পরীক্ষা শেষে তা ছুড়ে ফেলে ডাস্টবিনে। সকল ক্লাসের ইসলাম শিক্ষা বইয়ের জরিপ নিলে সব কটি ইসলাম শিক্ষা বইয়ের সমষ্টিতেও আপনি পূর্ণ দ্বীন ও দ্বীনি বুঝ খুঁজে পাবেন না। সেগুলোতে সাধারণত (ব্যক্তিগত) ইবাদত এবং কিছুসংখ্যক সভ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কিত আয়াত-হাদিস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পাঠদান করা হয়। যেগুলো পড়ে একজন মুসলমানের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সেই অপূর্ণাঙ্গ ধারণাই জন্ম নেয়, যার ফলে ধর্ম বলতে তারা বোঝে শুধুমাত্র মসজিদ, নামায, আযান এবং বড়জোর ইবাদত ও কিছুসংখ্যক চারিত্রিক গুণাবলিকে। যা আজ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর মতাদর্শ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জিহাদ ও খেলাফত ইত্যাদির মূলনীতি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হয় পশ্চিমাদের থেকে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনাই ছড়ানো হচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ নাগরিকই এই শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচির ছত্রছায়ায় শিক্ষার্জন করে বের হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আইনজীবী, সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক সকলেই এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে পড়াশোনা শেষ করে ভবিষ্যতে বিভিন্নজন বিভিন্ন সেক্টরে চলে যান। পাঠ্যসূচিও নির্ধারণ করে রাষ্ট্র, শিক্ষাব্যবস্থাও প্রণয়ন করে রাষ্ট্র এবং ডিগ্রিও

কার্যকর করা হয় তারই উপর ভিত্তি করে। আর এই ডিগ্রিই হচ্ছে সম্পদ ও সম্মান লাভের একমাত্র সোপান। এখন কেউ ইসলামিক স্টাডিজের হোক বা সাইন্সের, উভয়ই শিক্ষা করছে বা তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে ডিগ্রির জন্য। সুতরাং দ্বীনি ইলমও শিক্ষা করা বা প্রদান করা হচ্ছে দুনিয়ার জন্য। যদি আল্লাহ না করুন দ্বীনি মাদরাসা সমূহ ও সে সকল ওলামায়ে কেরামগণ না থাকতেন, যাদের বরকতে তাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা ইসলামের উপর অটল রয়েছেন, তাহলে না জানি উম্মাহর অবস্থা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াত?! (তা আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন।)

